ঘরোয়া কথায় পুষ্পিকা পরিচয়

যূথিকা বসু ভৌমিক

এই গ্রন্থ নিজ শিষ্য বিনে অন্যের নাহি দিবে।
প্রাণের সমান করি গোপনেতে থোবে।

—কেন এই গোপনীয়তা? শুধুই কি পরিশ্রম। না—তা হয়তো নয়। তবে, প্রাচীন সাহিত্যের অন্যতম প্রধান সম্পদ যে পুথি, তা বাঙালির একদা ছিল অনন্য ঐশ্বর্য। তাই কঠিন পরিশ্রমের বিনিময়ে যে কাজ, তার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ এবং সম্পদ রক্ষায় গোপনীয়তা দুই-ই জরুরি। আবার এমনও দেখা যায়—

—'এই পুস্তবক যে হরে তার চৌদ্দ পুরুষ নরকে পোড়ে'। শুধু কি তাই! —'এই পুস্তক যে হরিবেক তাকে গো ব্রাহ্মণ বধ লাগিবেক।'

আবার, 'এই পুস্তক যে চুরি করিবেক সে সাসুড়ে হইবেক'। তারপরও আছে,

—'চুরি করিয়া জিনি নিবেন তার এই বেবথা—এই গঙ্গার বন্দনা পুথি যিনি নিবেন তিনি মসাএর থানে (স্থানে) বেত খাবেন—আর আমিহ কান মলিএ দিব এবং তার মাতা ধরে...কিল মারিবে।'

বর্তমানকালের আদর্শ অনুযায়ী এমন অভিশাপ, কটূক্তি ইত্যাদি কুরুচিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থারই ইঙ্গিত দেয়। যদিও যুগের বিচারে ভালো মন্দের হিসেবে কোনটি সঠিক তা লিপিকরদের বিবেচনায় নির্দিষ্ট হয়ে থাকে না। তাই চোরকে কাছে পেলে তার কান মলে দেবার বিষয়ে চিন্তার যে প্রকাশ তা শুনে পাঠকের মনে স্বভাবতই হাস্যরসের খোরাক দানা বাঁধে।

এদিকে লেখকের দোষ খণ্ডন করে শুদ্ধ অশুদ্ধের প্রতি দৃষ্টি রেখে সচেতন মনটি বলছে :

যে আদরব পুথি দেখিয়া লেখা গেল তাহাতে
সকল অর্যুদ্ধ একারণ লিক্ষকে দোষ নাস্তি।।

শুধু তাই নয়,—

অজ্ঞানে লিখিল পুঁতি জানিয় কারণ।
পড়িতে পণ্ডিত জনে করিবা শুদন।।
অবুদের দোষ কিছু না ধরিবা মন।
অক্ষর না হয় ভাল জানিবা কারণ।।

—ব্যক্তি-বিশেষের ভাষায় হেরফের হলেও একই প্রসঙ্গে,

লেখিল পুস্তক আমি দিষ্টী অনুসারে।
লিক্ষকের দোষ নাই জ্ঞানীর গোচরে।।
তবে যদি কদাচিৎ হয় ভুল ভ্রান্তি।
ভিমের সমরে যেন মনের ভমতি।।

—আবার অপরাধ মার্জনীয় এমন অনুভূতি যে নেই, তা-ও নয়। তাই পাঠকের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে,

আপনি যুদ্ধ করি করিবে পঠন
লিক্ষকের অপরাধ করিবে মার্জন।

—এই যে একদিকে সাবধান বাণী, অন্যদিকে অভিশাপ, —কখনো স্বীকারোক্তি—কখনও শাস্তির বিধান, আবার অপরাধ মার্জনা—আবেদন নিবেদন—মোট কথা পুথিকে ঘিরে একাধিক সংলাপ। যদিও পুথি মাত্রেই এমন উক্তি নেই। স্বভাবতই প্রশ্ন এসে দাঁড়ায় এঁদের পরিচয় ঘিরে। এ যে ব্যক্তি-বিশেষের স্বগতোক্তি তা ঠিক। হতেও পারে খেয়ালি মনের হেঁয়ালি। এঁরা পুথির সমাপ্তিতে লিপিকাল ছাড়াও নাম, ধাম, ঠিকানা, মালিকের পরিচিতি, ব্যক্তিগত অনেক অভিপ্রায় অনুরোধ, কৈফিয়ত, কালের ব্যবধানে হারিয়ে যাওয়া দিনের ঘটনাবলী, ঘর গৃহস্থালী, গ্রাম জীবনের কথা, প্রাকৃতিক ভয়ভীতি, দৈব উৎপাত ইত্যাদি বিশেষ কিছু কথা সাধারণত পুথির শেষে বা খণ্ড-বিশেষের শেষে বা মূল বিষয়বস্তুর একধারে লিখে রাখতেন। মূলত ইচ্ছে অনিচ্ছের দোলায় বিচিত্র সব কথাগুলোকে পুথির অন্তরিনে যাঁরা আবদ্ধ করছেন তাঁরা 'লিপিকর' বা 'অনুলেখক' বা 'নকলকার'। এরা লেখাজীবী বটে তবে জাত লেখক নন। সাহিত্য সৃষ্টি এঁদের কাজ নয় তবে সাহিত্যের অনুলেখন এঁদের পেশা এবং নেশা। বিদ্বৎজনেরা এই ধরনের কথার অংশ-বিশেষকে নাম দিয়েছেন 'পুষ্পিকা বা 'Post colophone Statement'। আভিধানিক অর্থেও এই কথাসমূহ 'পুষ্পিকা' নামেই পরিচিত হয়েছে।

সহজ কথায় সংজ্ঞা দাঁড়ায় পুরাতন কালের মানুষের স্বরূপ উপলব্ধির নতুন দুয়ার বা প্রবেশ পথ। এই অংশের সংযোজন লিপিকারদের ইচ্ছেতেই হয়তো হত। যাই-ই

হোক না কেন, নানা বিবেচনায় কখনো-কখনো লিপিকরের আত্মবিবরণী বা দিনপঞ্জীও বলা হয়ে থাকে।

সুতরাং এঁদেরই জীবনের অন্তরঙ্গ সাহচর্যে জাতীয় প্রাণছন্দের ভেতর দিয়ে সাহিত্যের প্রকাশ হবে বা সন্ধান মিলবে তা-ই যথার্থ। সাহিত্য চিরকালই লেখক এবং পাঠকের বন্ধুত্বের সামগ্রী। বিশেষ করে আজকের জীবনবোধের চলতি পথে একদা অতীত শিক্ষা দান এবং শিক্ষাগ্রহণ সহ জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্রে পুথিপত্রের বিশ্লেষণ বা পরিচয় হারিয়ে গেছে বললে বোধ হয় সঠিক বলা হয় না।

বরং যান্ত্রিক কুশলতার যুগেও সাধারণত গ্রাম-গঞ্জ থেকে শুরু করে শহরাঞ্চলেও পুথি-পত্রের সন্ধানই শুধু নয়, ধর্মীয় আচার-আচরণ, দর্শন, বিজ্ঞান, কলা, শিল্প, সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতির অন্যতম আকর বলে পুথির পরিচিতি আমাদের জীবনানুষঙ্গে সংযোজিত ছিল। ফলে সন্ধানী মনের তরফে আজও গবেষণার জন্য পুথিপত্রের অন্তর্নিহিত বিচিত্র সব খবরাখবর বা সূত্র যেমন তাৎপর্যপূর্ণ তেমনি শিক্ষার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাড়া জাগাতেও বিশেষ সহায়ক।

তবে হ্যাঁ, পাঠকের মনে সন্দেহ জাগতে পারে বিষয়ের অপূর্বতা নিয়ে। কিন্তু যদি সঠিকরূপ দেওয়া যায়—তবে সে বিষয়টি যেমনই হোক না কেন অপূর্বতা আপনা থেকেই এসে পড়ে। আসলে প্রাচীন সাহিত্যের অন্যতম প্রধান সম্পদ যে পুথি তারই চারপাশ জুড়ে থাকা নানাবিধ উপকরণ সদৃশ সমকালীন সমাজ, অর্থনীতি-শিক্ষা-সংস্কৃতি-ধর্ম ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে ব্যক্তিবিশেষের দৃষ্টিকে সম্মোহিত করে।

সেকালে পুথির সমাদর বেশি থাকায় ঘরে ঘরে পুথি সংগ্রহ করে রাখার প্রবণতা ছিল বেশি। ফলে পুথির প্রতিলিপি প্রস্তুত করা হত এবং গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চলত আদানপ্রদান। এক সময় গ্রাম বাংলায় বৈষ্ণবের আখড়ায় 'চৈতন্য জীবনী' ও 'পদাবলী'র সমাদর ছিল। সমাজের সকল স্তরেই সান্ধ্যপাঠ, কথকতায় ঘরে ঘরে শোনা যেত শঙ্খ মন্দিরা। 'রামায়ণ-মহাভারত' পূজিত হত প্রায় সবার ঘরে। এমনও জানা যায় যে ইংরেজরা প্রথম যুগে এদেশে এসে কাজে লাগাতেন হাতে লেখা পুথি।

সেকালে পল্লী অঞ্চলে খুব কম লোক লেখাপড়া জানলেও পুথি নকল ছিল তখনকার দিনের এক পেশা। সময় সময় তা নেশায়ও পরিণত হত। এমনকি হাতের লেখা ভালো হলে স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ জাতিধর্ম নির্বিশেষে এই পেশা গ্রহণ করতেন সাংসারিক কারণে বা প্রয়োজনের তাগিদে।

সহজেই অনুমেয় যে অনুলেখন বা লিপিকরণের কাজটি নিঃসন্দেহে কষ্টসাধ্য। তা সত্ত্বেও জনৈক সত্তর বছরের বৃদ্ধ মানুষটি যখন পুনর্জন্মে লিপিকরের জীবন ভোগের

আশা প্রত্যাশা করে বলেন—

অতি বৃদ্ধ মুঞি নিকটে মরণ।
লোভে মাত্র লিখি কিছু না জানি মরম।।
জন্ম যদি হয় পুনঃ সংসার ভিতর।
ইহাতেই লোভ যেন থাকে নিরন্তর।।

তখন পাঠককুলের মনোজগতে সংশয় সৃষ্টি হয়। বিস্ময়কর এই উক্তি কৃষ্ণ দাসের 'বৃন্দাবনলীলাস্থান বর্ণন' পুথিতে লিপিকরের ইচ্ছাপূরণের অংশবিশেষ ঊনবিংশ শতকের সমাজজীবনকে আমাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। পুথিটি ১২৩৮ সালে অনুলিখিত।

জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী বীরভূম জেলার বড়চাতুরী গোয়ালপাড়া গ্রামনিবাসী পঞ্চানন আস লিপিকর হিসেবে বিশেষ খ্যাত ছিলেন। তিনি একাধিক পুথির অনুলেখন করেছেন। কোনো কোনো পুথিতে সামাঞীদহে তাঁর বাড়ি ছিল বলেও উল্লেখ রয়েছে। এই সামাঞীদহ অঞ্চলটিও গোয়ালপাড়া সংলগ্ন কোপাই নদী তীরবর্তী একটি গ্রাম। আলোচ্য অনুলেখকের পার্থিব জীবনে রূপ-রস-গন্ধের মাদকতায় কঠিন এবং পরিশ্রম-সাপেক্ষ লিপিকরের বৃত্তি সহজাত প্রবৃত্তির পরিচায়ক। ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা তাঁকে যেমন বিব্রত করেনি তেমনি জীবনের প্রান্তসীমায় এসেও তিনি বিচলিত হননি। যান্ত্রিক কুশলতার যুগে পরজন্মের কাল বিচিত্রায় তাঁর হাতে লেখা পুথি তাকে কতদূর সুভাষিত করবে তা অনুমান নির্ভর।

সাধারণত পুথির মূল বিষয়বস্তুর প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করাই স্বাভাবিক। এবং পুথি-কেন্দ্রিক গবেষণার ক্ষেত্রও হয়ে থাকে আভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তু। এছাড়া পুথি সম্পাদনা, বিভিন্ন রচয়িতার একই পুথির তুলনামূলক আলোচনা ইত্যাদি তো আছেই। অন্যদিকে কোনো কোনো পুথিতে মূল রচনার অতিরিক্ত কিছু টুকরো কথা পাঠকের নজর কেড়ে নেয়, যার সঙ্গে মূল বিষয়ের কোনো যোগ নেই। উপরন্তু এসব কথা, নামধাম ঠিকানার সঙ্গে সব সময় যে পুথির শেষে থাকে তা নয়। আগেই বলেছি যে কখনো-কখনো অধ্যায় শেষে কখনও দিনের অনুলেখন চলতে চলতে পারিপার্শ্বিক চিত্রপট বা তাৎক্ষণিক ঘটে যাওয়া বিশেষ কোনো ঘটনা ইত্যাদি ইত্যাদি বা শতাব্দীর বিশেষ কোনো ঘটনাকে স্মরণ করে দিনক্ষণ সময়ের উল্লেখে তাকে গুরুত্ব সহকারে লিখে রাখা মনে হয় লিপিকর বা অনুলেখকের বৃত্তি জীবনের এক মহান কর্ম। ভেবে অবাক হতে হয় যে 'মহাভারত' স্বর্গারোহণ পর্বের একটি পুথিতে পুষ্পিকাংশে লিপিকরের নাম-ধাম ঠিকানা সহ লেখা হয়েছে 'সিরাজ দৌল্লার ফৌতি'। ফৌতি মানে মৃত্যু। লিপিকর এহেন কথার উল্লেখ কেন করলেন তা আমাদের জানা নেই।

পুষ্পিকাটি নিম্নরূপ :

মহাভারত/কবীন্দ্র

পুস্তক লিখিতং স্বহমস্তাক্ষর শ্রী রামপ্রসাদ শর্মা বাগছি (বাগচি) সাং চন্দ্রপুর পরগনে সোনাবাজু তপ্পে (তরফে) চাঁপেলা সরকার বাজুহার তালুক শ্রীযুত বৃন্দাবন চন্দ্র দেব দেবস্য শকাব্দ ১৬৭৯ ষোল শত ঊনআশী সুবেদারী নবাব সিরাজদৌল্লার ফৌতি তারিখ ১৮ই আষাঢ় যেওজ মিরজাফর জমিদার শ্রীমতী রানী ভবানী দেব্যা গোমস্তা দয়ারাম রায় সন ১১৬৪ পুস্তক সমাপ্ত তারিখ ১২ শ্রাবণ রোজ সোমবার দিবা ১ প্রহর সদা সাং (?) তিথৌ...

বিশ্লেষণে অনুমান হয় যে লিপিকরের মনে হয়তো প্রতিমুহূর্তেই এর প্রতিফলন হচ্ছিল। বিশেষ করে তিথি সন তারিখের উল্লেখ যেভাবে করেছেন তাতে বিষয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। পুষ্পিকা সূত্রে ঘটনার দিনটি নিঃসন্দেহে স্মরণীয়। বলা যায় বাংলার ইতিহাসের একটি বৃহত্তর অধ্যায়। লিপিকর ঘটনার সাজুয্যে পুষ্পিকাতে শকাব্দ ১৬৭৯ এবং বঙ্গাব্দ ১১৬৪ বলেছেন। ফলে ইংরেজি সনের হিসেবে কালটি দাঁড়ায় ১৭৫৭ সাল (খ্রিস্টাব্দ)। বাংলার নবাব তখন সিরাজদৌল্লা। এই ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধে সিরাজদৌল্লা পরাজিত হয়ে নিহত হন। ফলে, নবাব সিরাজদৌল্লার 'ফৌতি' কথাটির পাশাপাশি সন তারিখ সঠিক বর্ণিত হওয়াতে পুষ্পিকার গুরুত্ব বেড়ে গেছে। তেমনি ইতিহাসের প্রামাণিক তথ্যও বর্ণিত হয়েছে। পুষ্পিকাতে উল্লিখিত অপর ঐতিহাসিক ব্যক্তি মীরজাফর এরপর ইংরেজদের সহায়তায় সিরাজদৌল্লার পরে বাংলার নবাব হন। লিপিকর পুথি সমাপ্তি কাল বলেছেন ১১৬৪ বাংলার ১২ই শ্রাবণ। আর সিরাজদৌল্লার মৃত্যু তারিখ ১৮ই আষাঢ়। অর্থাৎ মাত্র মাসখানেকের ভেতরই আলোচ্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে লিপিকরের মনে এবং রচনায় বিষয়টি বিশেষভাবে রেখাপাত করেছে। আলোচ্য পুষ্পিকার সূত্র থেকে পাঠকদের স্মরণ করানো যায় যে আড়াই শত বৎসরেরও বেশি প্রাচীন ঘটনা উল্লেখে লিপিকরগণ আমাদের ঐতিহাসিক ঘটনার সত্যতা বিষয়ে নিশ্চিত করেছেন।

কবিকঙ্কনের 'মঙ্গলচণ্ডী' পুথির পুষ্পিকাতে বর্ণিত 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' কথাটিও অন্যতম সত্যের এক স্পষ্ট প্রতিবেদন। এর গুরুত্ব বিদগ্ধ ঐতিহাসিকের পক্ষেও অস্বীকার করা অসম্ভব। প্রকৃতির অনিয়মে মানুষের জীবনের পরিবেশ যেভাবে বিধ্বস্ত হয় তা জীবনের শেষ পরিণতির চরম মূলধন।

মন্বন্তরের এক বছর কাল পার করে ১১৭৭ সালে অনুলিখিত 'মঙ্গলচণ্ডী' পুথির লিপিকর নন্দদুলাল দেবশর্মা ১১৭৬ সালের মহামন্বন্তরের যে স্পষ্ট বিবৃতি তুলে

ধরেছেন পুষ্পিকায় তাকে অস্বীকার করার কোনো প্রশ্ন থাকে না। পুথিটি এক বছর বাদে লিখিত হলেও জনৈক সত্তর বছরের বৃদ্ধের মনে মহামন্বন্তরের যে ভয়াবহ ছাপ পড়েছে তাকে ভুলে যাওয়া বা ভুলে থাকার কোনো ব্যঞ্জনা নেই। এই মন্বন্তরের মতো অন্য কোনো মন্বন্তরের কথা আগে কেউই শোনেননি। পুষ্পিকাটি—

'ইতি শ্রীশ্রী 'মঙ্গলচণ্ডী কা'র পুস্তক সমাপ্ত।।.।। জথা
দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো নাস্তি দোসক।।
ভিমস্থ্যাপী রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মত্যিভ্রম।।.।।
ভিম আদি করিয়া যে ভঙ্গ দেয় রণে। অবিস্কক
মতিভ্রম মহামুনিগনে।। জদি বাটী বাড়ী হয়
না লবে অপরাধ দোষ ক্ষেমা করি সভে করিবে
আসির্ব্বাদ।।।পুস্তক পড়িতে দিবে সুবুদ্ধির
ঠাঁই।।। গবাগুনা গ্রন্থ জেন গোবরায় নাই।।
ইতি লিখিতং শ্রী নন্দদুলাল দেবশর্ম্মনস্য।
সন ১১৭৭ সালের ২৭ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবারে।।

অষ্টাহ পুস্তক সমাপ্ত হইল। নিজ বাটিতে নিজ ঘরে দক্ষিণ দ্বায়রির ঘরে পিড়াতে বস্যা লিখ্যা হইল। শ্রীশ্রী মঙ্গলচণ্ডীকায়ৈ নমঃ। শ্রীশ্রী সিবায় নমঃ শ্রী শ্রী জয় দুর্গায়ৈ নমঃ। শ্রীশ্রী গুরবে নমঃ সাং খণ্ডঘোষ। সন ১১৭৬ সাল মহা মন্বন্তর হইল অনাবৃষ্টি হইল সস্যি হইল না কেবল দক্ষিণ তরফ হইয়াছিল আর কোথাও কোথাও জলা ভূমে হইল টাকায় ১২ সের চালু...সাড়ে ছয় পোন চালু সের হইল তৈল ২।। আড়াই সের লবন ১৩ সের কলাই ১১ সের তরিতরকারী নাস্তী শাক নাস্তী কিছু মাত্রেক নাস্তী এই কথা সত্তর বৎসরের মুন্বিসী বলেন, আমরা কখনও এমন ষুলি নাই ইহাতে কতকত মন্বিসী মরিল বড় বড় লোকের হাড়ী চাপে নাই বাং সন ১১৭৭ সালের মাহ ভাদ্রতক মহা প্রলয় হইল এই সন রহিল আর কী বা হয়।...শ্রাবণ মাসে টাকায় ৪ চারি সের চালু হইল অনেক মুন্বিস্বী নষ্ট হইল মহামন্বন্তর।'

অষ্টাদশ শতাব্দে অনাবৃষ্টির ফলে যে মহামন্বন্তর হয়েছিল, উল্লিখিত পুথির লিপিকর নন্দ দুলাল দেবশর্মন এর প্রত্যক্ষদর্শী। ১১৭৬ সনে স্বচক্ষে দেখা বা অনুভূত হওয়া মহামন্বন্তরের বাস্তব চিত্র তাকে বিচলিত করেছিল। এমনকি সত্তর বছরের এক বৃদ্ধের মনেও সারাদেশ জুড়ে যে মানুষের জীবনে দুর্দশা, তার করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পাবার কথাও যেন ভুলে গিয়েছিলেন।

সমকালীন ঘটনার উল্লেখ আরও অনেক পুষ্পিকাতেই পাওয়া যায়। 'সুদামার দারিদ্র ভঞ্জন' পালার লিপিকর ১২৩৫ সালে বাংলাদেশের রাঢ় অঞ্চলে অনাবৃষ্টির সংবাদ পরিবেশনে বলেছেন, গ্রামে চাষআবাদ প্রায় ছিল না। লিপিকর পুথি লিখে দিন কাটিয়েছেন। চালের দর বেড়ে টাকায় ২৪ সের হয়েছিল, তাও পাওয়া যায়নি। ওদিকে জমিদারি তহশিলদারদের উৎপীড়ন চলত কর সংগ্রহের জন্য। পুষ্পিকার অংশ-বিশেষ—'গ্রামের লোক অন্য গ্রাম দিয়া জাই(তে) লাগিল পেটের খাতিরে পলাইতে লাগিল। অন্য গ্রামের লোক বলে বেল ভেক লোক এ লোক রাখা হবে না জদি রাখ(া) হয় তবে আপনাদের জদি চাকর ছাড়িএ রাখ(া) জায় তবে ওই লোক মাহ কার্ত্তিক মাসে জদি দেবতা জল হইলে ওই লোক বলিবে কি আমা(দের) দেসে জল হয়্যাসে বাড়ী জাই চলরে কম্ম বসাইতে হবে য়তএব রাখে না আর যে গ্রামের ধম্ম কম্ম নাই আর মনুস্য নাই আর গ্রামে মণ্ডল খোসামুদে হয় আর বোঙাঞি গ্রামে অনেক কুড়খেক মণ্ডল আছে ইতি—সন ১২৩৫ সাল ১৬ আসাঢ়—"

পুথি অনুলেখন বৃত্তি হিসেবে গৃহীত হলেও ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সাধনার জন্য সেকালে ঘরে ঘরে পুথি রাখা ছিল অপরিহার্য যা আগেও বলেছি। একালের অত্যাধুনিক জীবনধারায় ধর্ম বা ধর্মীয় প্রভাব সামাজিক জীবনে প্রকারান্তরে মানুষের মনকে দোলায়িত করে চলবে তার কোনো সঠিক পথ নেই। বরং প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় পুথি পঠন বা লিখন সামান্যতম হলেও ভক্তি প্রকাশের পরিচায়ক হতে পারে। যেমন, লিপিকর দুর্বল মনে ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে গিয়ে স্বভয়ে বলেছেন—

হরিধ্বনি বল ভাই তরিবে সংসারে।
এই পুথি লিখিবেক সে বৈকুণ্ঠ পাইবে;
এই কথা য়ুনে ভাই স্বর্গকে জাইবে।

পুথি সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ কথা হল-পুথি নিরতিশয় শ্রদ্ধা এবং পূজার সামগ্রী বিশেষ। ১৭২০ শকাব্দে নকলীকৃত 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে জনৈক লিপিকর গুরুপদে নিবেদন পূর্বক পুথিপাঠের কতগুলি নিয়ম বা নির্দেশ ব্যক্ত করেছেন যা সমাজের যে-কোনো পাঠকের শিক্ষণীয়। এবং তা মেনে চলাও বাঞ্ছনীয়। —'ইহার নিয়ম অশান্ত হবেক নাই নির্বিঘ্ন স্থানে রাখিবে। গ্রন্থ পাঠের স্থানে তবাক খাবা নাস্তী অন্য কথা নাস্তী দীর্ব্বাসনে বারাম দীবে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে ২ পায় হাত না দীবে পায়ে কাপড় ঢাকা দিয়া বসিবে, সাধুসঙ্গ করিয়া বুঝিবে অন্য হৈতে নয় বিনা সাধু সঙ্গে গোচর নহে। এসব নিয়ম না করিলে উচ্ছন্ন ভাব ভাল হবেক নাই ইহা সত্য সত্য সত্য। ইতি।।'

গ্রাম বাংলায় সহজ-সরল মানুষের জীবনে ধর্মের প্রতি অনুরাগ আজও ব্যাপকভাবে সক্রিয়। পুস্পিকাতে ধর্মীয় চেতনা বোধের উপকরণ একাধিক। ব্যাবহারিক জীবনে উপাস্য দেবতার পূজাই প্রধান, সেই সঙ্গে ব্রত-পার্বণ, ধর্মীয় নানা আচার অনুষ্ঠান, উৎসবাদি একালেও নিত্য নৈমিত্তিক। এমনকি ধর্ম সম্পৃক্ত গ্রন্থাদিও বিষয়গতভাবে রচনার স্থান নির্বাচনে ধর্মের প্রতি অনুরাগ দৃষ্টি হয়। সেকালে সাধারণভাবে পুথি রচনার স্থান হিসেবে পুস্পিকাতে গোয়ালঘরের মাচা থেকে শুরু করে বাঙ্গালা ঘর, বৈঠকখানা, দহলিজ, টোল, চৌপাড়ী ইত্যাদি যেমন পাই তেমনি দৌলতপুরের দেবোত্তর জায়গায় বসিয়া, নাটমেলাতে সমাপ্ত, শ্রীশ্রী ঠাকুরবাড়িতে ইত্যাদি স্থানের উল্লেখ গ্রন্থ রচনার শুরু বা সমাপ্তির জায়গা হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে। ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানের দিনটিও শুভদিনের বিবেচনায় যেমন বলা হয়েছে—

'মাহ আসাড় রথযাত্রা দিবসে এক প্রহরের মধ্যে সমাপ্ত।'

গার্হস্থ্য জীবনে ধর্মচিন্তা বা ধর্ম সাধনার সঙ্গে শ্রী বৃন্দাবন পরিদর্শন করে ভগবৎ কৃপা লাভের আকাঙ্ক্ষা সাধারণ বাঙালি মননকে দিন দিন বা যুগ যুগ উদ্বোধিত করেছে। এবং আজও করে। কেবলমাত্র ধর্মের প্রতি দুর্বলতার কারণে ভক্তিভাবের ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে তা নয়, নিজ নিজ ইষ্ট দেবতার প্রতি শ্রদ্ধাবশত ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন পুস্পিকাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে প্রতিফলিত হয়েছে। জনৈক বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী লিপিকরের ভাষায়—

শ্রী গুরু পাদপদ্ম মনেত ভাবিয়া।
লিখিল যে এই গ্রন্থ আনন্দিত হৈআ।।
বৈষ্ণব পদে মন রুহক অনুক্ষণ।
সভার চরণে এই করি নিবেদন।।

মুসলমান সমাজেও এই ধারা যে অবিচ্ছিন্ন ভাবে বহমান ছিল তার একটি উদাহরণ তুলে ধরা যাক—আলাওল বিরচিত 'তোহফা' গ্রন্থে লিপিকর আচমত আলী লিখেছেন

—'শ্রী ছৈদ ওয়াশীল পর উপকারী
সদা মন ধ্যানে তান ধর্ম কর্ম করি।।
তান আজ্ঞা পাই জন্য হিম আচমত আলী।
প্রিতিবাসী ইলসাবাসী লেখিল পাঞ্জালী।।

—বাহ্যতঃ ভিন্ন রুচি ভিন্ন মত বা সংস্কার প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে লক্ষ করা গেলেও ভগবৎচেতনায় এক আশ্চর্য সমন্বয় আমাদের তথাকথিত ধর্মজীবনের বৈশিষ্ট্য নিয়েই প্রকাশিত।

সত্য মিথ্যের যাচাঞী করা সঙ্গত নয় বলেই হয়তো সেকালের সরল মানুষগুলো বলতে পারে—

মনে ভাবি দেখ ভাই আর গতি নাই।
ভবার্ণব তরিবারে শ্রী গুরু গোঁসাঞি।
রতিরাম দাসে তবে মনে বিমর্সিয়া।
নানা শাস্ত্র হতে শ্লোক লইল উদ্ধারিয়া।।
এই পুস্তক যে বা পঠে শুনে গায়।
অন্তকালে সেই জন কৃষ্ণপদ পায়।।
যেই জন পুস্তক লিখি ঘরেতে রাখয়।
কদাচিৎ সেই গৃহ লক্ষ্মী না ছাড়ায়।।

ভবিষ্যৎ কর্ম সংস্থান অর্থনীতির একটি মূলকথা। দেখা যায়, সাতশত উননব্বই পাতার একটি বিরাট পুথি নকল করতে লিপিকরের বেশ কিছু দিন সময় লেগেছিল। অর্থনীতির দিক থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পুষ্পিকাটি—'ভারথ পুস্তক'।—

'এই অষ্টাদশ 'ভারথ পুস্তক' শ্রীগোবিন্দ রাম রায়ের একোয়ান পত্র অঙক সাতশত উননব্বই পাতে সমাপ্ত হইয়াছে।... ইহার দক্ষিণা জন্মাবিধি সামান্যতা ক্রমে অন্নসত্রে পরিপাল্য হৈয়া সশ্রদ্ধা হইয়া পুস্তক লেখিয়া দিলাম নগদ দক্ষিণাহ পাইলাম। তারপর রোজকারহ বৎসর ব্যাপিয়া পাইবার আগ্যা হইল।।৪।। যুভমস্তু শকাব্দা ১৬৩৬ ইতি সন ১১২১ তারিখ ২৫ কার্তিক রোজ বৃহস্পতিবার দিবা দ্বিতীয় প্রহর গতে সমাপ্ত।'

অষ্টাদশ শতকের এই পুষ্পিকায় পুথির অধিকারী ব্যক্তির আর্থিক সচ্ছলতা বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। এখানে অন্য যে কথার গুরুত্ব রয়েছে তা অন্নসত্রের উল্লেখ। এছাড়াও লিপিকরের দারিদ্রতার দিকটিও লক্ষণীয়। লিপিকর নিজেই জন্মকালীন সময় থেকে দারিদ্রতাবশত অন্ন বিতরণ শালাতে প্রতিপালিত হয়েছেন এবং সে কথা তিনি স্মরণে রেখেই পুথি অনুলেখন কাজে বৃত হয়েছিলেন। পরবর্তী সময় কালে পুথির মালিকের উদারতায় সারা বছর ধরে রোজগারের সুযোগ তার জীবনে মহামুল্যবান আশীর্বাদস্বরূপ।

আমরা লক্ষ করছি যে উল্লিখিত পুষ্পিকাটি অর্থনীতির দিক থেকে বৈচিত্র্যের আভাষ-স্বরূপ। ১১১০ সালে 'মহাভারতে'র বিরাট পর্বের একটি খণ্ডিত পুথির ৮৪ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, 'এ পুস্তকের দক্ষিণা টং (টঙ্কা) ১ টাকা হইল।'

আবার 'কালিকা মঙ্গল' পুথির লিপিকর ১১৫৯ সালে লিখছেন, 'ইহার দক্ষিণা একজোড় কাপড় আর দুইতঙ্কা আড়কাট'। এখানে অর্ধ শতাব্দীর ব্যবধানে আমরা

দেখতে পাচ্ছি দক্ষিণার তারতম্য এবং তাই স্বাভাবিক মনে হয়। তেমনি 'আড়কাট' শব্দটি 'আর্কট' শব্দের অপভ্রংশ। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দক্ষিণ ভারতে তৈরি টাকাকে 'আর্কট' বলা হত।

এমনও দেখা যায় (১১) এগারো পাতায় সমাপ্ত হওয়া 'দাতা কর্ণের পালা পুথির জন্য লিপিকর পেয়েছেন কাগজ শুদ্ধ 'সাড়ে পাঁচ পৌণ কড়ি।' একদা ভারতবর্ষ তথা বাংলা ভ্রমণকারী বিদেশী পর্যটকগণ মুদ্রার মূল্য হিসেবে ব্যবহার করতেন কড়ি। বিশেষ ভাবে বলতে হয় যে, মালদ্বীপ থেকে আগত এই কড়ি ছিল হলদে রং-এর ডোরাওয়ালা। দুর্লভ ছিল এই কড়ি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে খাস কলকাতায় কড়ির প্রচলন ছিল। এদিকে, শ্রমের মূল্য দ্রব্য দিয়েও বিবেচিত হত। কালের বিচারে সে মূল্য যা-ই হোক না কেন, লিপিকর অত্যন্ত অনুনয় সহকারে বলেছেন,

এই পুস্তক তোমায় লিখিয়া দিলাম এহার
জন্যের তবে তোমায় লিখিয়া জাতেছি যে
আমায় একখ্যান গামচা আমায় দিবে আমি
গা পুছিব অতেব জানাতেছি লিখিয়া ইতি।—

—এখানে পারিশ্রমিক মুখ্য নয়, আশু চাহিদাই সদিচ্ছার সমাধান বলে মনে হয়। উপরন্তু লিপিকর এবং পাঠকের সম্পর্কও অত্যন্ত সহজ ছিল বলা যেতে পারে। ন্যূনতম চাহিদায় আত্মতৃপ্তির এমন দুর্লভ নজির আমাদেরকে বিস্মিত করে। সহজ কথায় সরল মনের চাহিদা যে কেবল প্রয়োজন মেটাবে তাও যেমন সত্য হতে পারে তেমনি কালের বিচারে স্বদেশি বস্তুর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বা মর্যাদার নিরিখে আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আবার কেউ যদি বলে 'দক্ষিণা দিতে হবে' না দিলে...' —এই যে জেহাদ 'না দিলে' সত্যি কি হবে বা মালিকের ভাগ্যে উত্তম-মধ্যম কিছু জুটেছিল কি না—তার কোনোটাই আমাদের জানা নেই অথবা লিপিকর কেনই বা এমন ভাবের প্রকাশ করল তাও আমাদের ভাবনাকে নানা দিকে চালিত করে। তবে দক্ষিণা আদায়ে এমন ভাবটি কিছুটা কৌতুককর যেমন, তেমনি উভয়ের মধ্যে সমতার অভাবও থাকতে পারে।

লিপিকরণ বা অনুলেখনের কাজটি বৃত্তির তাগিদেই হোক বা নেশাই হোক—কাজটিতে জাত ধর্মের যে কোনো বাছ-বিচার ছিল না তা পুথির পাতাতেই স্পষ্ট। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে মাঝি, কায়েত, গোপ, ধুপী প্রভৃতি একাধিক নিম্ন বর্ণজাত লোকেরাও যে পাঠক বা লিপিকর ছিলেন তারও বহু নিদর্শন পুথির পাতায়

পাতায় ছড়িয়ে আছে। ফলে সমাজের উচুঁ স্তরে যে শুধুমাত্র শিক্ষাদীক্ষা আবদ্ধ ছিল তা নয়।

বাংলাদেশে সাধারণ শ্রেণিভুক্ত বিভিন্ন বৃত্তিজীবীদের মধ্যে কুম্ভকার, কর্মকার, সূত্রধর প্রভৃতি বর্ণের অনেকেই অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে পুথি লিখেছেন। অনেক ক্ষেত্রে আবার তথাকথিত উচ্চবর্ণের ব্যক্তিরা এঁদের জন্য পুথি লিখেছেন। যেমন—

১১৩৩ সালে মথুরা মোহন মজুমদার 'মহাভারত' লেখেন বলাই তাঁতির জন্য।

'১১২০ সালে 'সুদামা চরিত্র' লিখেছেন কৃষ্ণ প্রসাদ শর্মা হরেকৃষ্ণ কুম্ভকারের জন্য।'

শুধু যে হিন্দুরাই পুথি লিখতেন এমনও নয়। বাংলা সাহিত্যের প্রতি হিন্দু-মুসলমান সকলেরই আগ্রহ ছিল। কবিচন্দ্রের 'গুরু দক্ষিণা' পুথির পুষ্পিকাতে পাই—

মহামহিম শ্রীযুক্ত রামমোহন পান কস...কজেনঞ্চ
আগে আমি মোহাসএর শ্রীচরণা-আশীর্ব্বাদে
এজন্য...সেবক শ্রী শেখ রেজাউদ্দীন।

নারী সমাজে পুথি নকল করা এবং পাঠ-করা এ দুয়েরই ব্যাপক প্রচলন ছিল। সম্ভ্রান্ত ঘরে এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও বহুকাল আগেই চলে এসেছে। বিষ্ণুপুরের রাজমহিষী ও রাজকন্যারাও যে বাংলা পুথি পড়তেন, তা তাদের স্বহস্তে লিখিত গ্রন্থ থেকে জানা যায়। ঊনবিংশ শতকের প্রথম পাদেই সাধারণ ঘরের মেয়েরাও যে লেখাপড়া কিছু জানতেন এবং প্রয়োজনবোধে পুথি অনুলেখন করতেন তারও উদাহরণ আমরা পেয়েছি। যেমন, 'গুরু দক্ষিণা' পুথিতে—

'ইতিসন ১২০৯ সাল তারিখ ৬ তারিখ কৃষ্ণ পক্ষ দশমী-এ পুস্তক শ্রীমতী কৃষ্ণমণি দাসি সাকিম বহুবাজার।' —অর্থাৎ কলকাতা অঞ্চলে নারী শিক্ষার প্রচলন ছিল। সমাজে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মেয়েদের শিক্ষাদানের কথা আমরা আগেই বলেছি। ত্রিপুরাতে এই বিষয়ে সুনিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়। বহু প্রাচীনকাল থেকেই ত্রিপুরার মহিলা মহলে বাংলা চর্চা হয়ে আসছিল। বিশেষ করে রাজ অন্তঃপুরীয়দের মধ্যে শিক্ষিতা মেয়ের সংখ্যা স্মরণীয়। সেখানে সাধারণ মেয়েদের ক্ষেত্রেও উল্লেখ্য যে ১২৪৪ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ১৮৩৪/৩৫ খ্রিস্টাব্দে নরোত্তম দাসের 'প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা' গ্রন্থে লিপিকর হিসেবে নাম পাই সুভদ্রা বৈষ্ণবীর। আগরতলা তার মোকাম। আরও স্মরণ করা যেতে পারে যে ত্রিপুরার মহারাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের রাজত্বকালে (১৮২৯ খ্রি.-১৮৫০ খ্রি.) ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় স্থানান্তরিত হয়। সম্ভবত স্থানান্তরের পরে পুথিটি অনুলেখন করা হয়েছিল। মনে হয় কলকাতা অঞ্চলেও পুথিতে উল্লিখিত কাল নাগাদই

স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন হলে ত্রিপুরাতেও তার প্রভাব পড়েছিল। সেক্ষেত্রে সুভদ্রা বৈষ্ণবী প্রকৃষ্ট উদাহরণস্বরূপ।

ভারতীয় ঐতিহ্যের অধিকারী বাঙালি সমাজের রূপ ও রূপান্তরের ইতিহাসে পট পরিবর্তন হলেও গ্রামীণ বাংলার সমাজ জীবন আপন বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। এখানে পল্লী জীবনের একটি ঘটনায় মর্মস্পর্শী পুষ্পিকাটি মূল্যবান। মানুষের জীবনে অনেক অজ্ঞাত সত্যের অন্যতম যে মৃত্যুবোধ তার আনাগোনায় সময়ের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে না। আলোচ্য পুষ্পিকায় ঘরোয়া জীবনের এক বিশেষ রূপ পাঠকের মনে বিষণ্ণতার ছায়া ফেলেছে। পুষ্পিকাতে পুত্রশোকে কাতর কোনো এক স্নেহান্ধ পিতার মনোভাবে স্বাভাবিক জীবনবোধের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হতে দেখে শাশুড়ি মায়ের সুপ্ত চেতনাবোধে সহজ-সরল মাতৃত্বের প্রকাশ ঘটেছে। পুত্র শোকাচ্ছন্ন জামাইকে ঘরের কোণে শোক করতে দেখে মাতৃত্ববোধে উদ্ভাসিত এক মায়ের নির্দেশ নিশ্চিত ভাবে লিপিকর জামাইটিকে উৎসাহ জুগিয়েছিল। ফলে মায়ের আদেশ পালন করতে 'শরীর নির্ণয়' পুথিতে লিপিকর অভিরাম হালদার লিখেছেন :

> সঅক্ষরশ্রী অভিরাম হালদার সাং চণ্ডীবাড়ীর এই পুস্তক আমি লিখিলাম আমার শ্বশুর মহাশয়ের দীগার দক্ষিণের ঘরের ভিতরে বসিয়া (এখানে) আসিয়া লিখিলাম কেন না আমার একটি পুত্র সন্তান মরিয়াছিলেন তাথে করিই বড়ই মনস্তাপ হইয়াছিলেন। তা অথেব আমার শাশুড়ী মাতা ঠাকুরানী আমার দীগের আনিয়াছিলেন তাথে করি কহিলা যে নিতান্ত বসিয়া থাক একখানা পুস্তক লিখ।। বসে বসে। ইতি সন ১২৭০ সাল তাং ১৯ বৈশাখ—রোজ যুক্রবার।'

মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে মামা-ভাগনের সুমধুর সম্পর্কের নানা প্রবচন বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত। কোনো কোনো পুষ্পিকাতে এমনও দেখা যায়, যে পুথি অনুলেখনেও অনুরূপ সম্পর্কিত মামা-ভাগনে রামধর্ম চক্রবর্তী ও নীলাম্বর চক্রবর্তী উভয়ে মিলে ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে কাশীরাম 'মহাভারত-দ্রোণপর্ব' নিমাইচরণ পাশের চণ্ডি মণ্ডপে বসে শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে সমাপ্ত করেছেন। পুষ্পিকাটি—

'যথা দৃষ্টাং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোস নাস্তি। ভিম স্যাপী রণে মঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। ইতি দ্রোণ পর্ব্ব সমাপ্ত। লিখিতং শ্রী রামধর্ম চক্রবর্তী ও শ্রী নীলাম্বর চক্রবর্তী এই মামা-ভাগনে দুই জনাতে সন ১২৩১ সালে ২২ বৈশাখ রোজ শুক্রবার তিথি সুক্কুল পক্ষের পঞ্চমিতে শ্রীযুৎ নিমাই চরন পালের চণ্ডি মণ্ডবে করিলাম।' আবার বনমালী দাস বসু কালীরাম দাসের 'স্বর্গ আরোহণ' পর্বের পুথিটি সমাপ্ত করেছেন ১২১৬ সালে ময়নাপুরের মাতুল বাটীতে। কেউ-বা কালী ঠাকুরানীর চালায় বসে, বাইর

বাড়ির ঘরেতে, দাদামশায়ের মোজাতে বসে, হরিদাসের ঘরের দক্ষিণ পিড়াতে পূর্বমুখে বসে ইত্যাদি ইত্যাদি স্থানেরও উল্লেখ রয়েছে।

পুষ্পিকায় অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয় হল লিপিকাল। আমাদের দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সনের (era) প্রচলন ছিল। বর্তমানে এই সব সনের কিছু কিছু বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অঞ্চল-বিশেষে যেসব সনের উল্লেখ পুথির পুষ্পিকাতে পাওয়া গেছে তার ভেতর—অমলি, রাজড়া, মল্লাব্দ, জমিদারী, ত্রিপুরাব্দ, মঘী, হিজরী, বিষ্ণুপুরী, সম্বৎ, খৃষ্টাব্দ, শকাব্দ, বঙ্গাব্দ-উল্লেখ্য।

আগেই বলেছি সম্পূর্ণ ঘরোয়া কথায় চারপাশের বিশেষ কিছু ঘটনাকে মনে রাখার জন্যই সম্ভবত পুথির শেষাংশে চলমান জীবনের কিছু প্রতিচ্ছবি লিখে রাখা হয়েছে। মহাভারত-আদিপর্ব পুথিতে—

> ইতি সন ১২৪১ সাল তাং ১০ মাঘ। বার লক্ষ্মিবার
> বেলা ১।। ডেড় প্রহর আপন মেলায় পুবমুক্ষে
> লেখিয়াছি।। শ্রীরাম জীবন গোস্বামী।।
> সেই দিনে নিহাল বাড়ুজ্জার মা-এর সাঙ্গ।। সেই
> দিন নিরঞ্জন গোস্বামীর মরাই (...) মোষ গুচ্ছে।।

এখানে ১০ই মাঘ লক্ষ্মীবার অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টার সময় পুবমুখে নিজ ঘরে বসে পুথি সমাপ্ত করেছেন লিপিকর রামজীবন গোস্বামী। তিনি এমনও লিখেছেন সেই দিনেই তাঁর প্রতিবেশী সুহৃদ ব্যক্তি নিহাল বাড়ুজ্জার মায়ের মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যু লিপিকরের মনে বিশেষ ভাবে রেখাপাত করেছিল বলেই হয়তো এহেন উল্লেখ। ওদিকে পারিপার্শ্বিকও তাকে আকর্ষণ করেছিল। তাই সম্ভবত নিরঞ্জন গোস্বামীর ধান রাখার গোলাকার ঘরের দিকে মোষ ঘুরতে দেখে তাও লিখে রেখেছেন।

এমনই 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য। সেখানে কাব্যের এগারো পালা শেষের মুহূর্তে 'পিত ঠাকুর মহাশয়ের তামাক খাওয়া', 'ঠাকুরান দিদির কুটনা কোটা', 'নিত্যানন্দ ঘোষের গোলায় কষ দেওয়া'—ইত্যাদি বর্ণনায় লিপিকর কালিকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় অন্য এক সাংসারিক জীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন।

প্রাথমিক বিচারে এই সমস্ত উক্তির কোনো গুরুত্ব নেই বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বিস্তৃত ব্যাখ্যায় পুথির অন্তর্নিহিত নিদর্শন পল্লীবাসী গৃহস্থের সহজ-সরল জীবনচিত্রের পরিচয়-স্বরূপ। সেই সঙ্গে বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সমকালীন প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের উপকরণ অনায়াসলভ্য হয়ে উঠতে পারে। 'সন্ধান এবং সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে তার সীমা নাই'—রবীন্দ্রনাথের উক্তিটি এখানে প্রাসঙ্গিক। তাই

বলা যেতে পারে যে, ঘরোয়া কথায় পুষ্পিকার শ্রেণিবিন্যাসে গবেষণার ক্ষেত্রও অমূলক নয়। ভাষাগত দিক থেকে যেমন অঞ্চল-বিশেষও তেমন সমকালীন প্রভাব যুক্তিসঙ্গত। সেই সঙ্গে বানানের ক্ষেত্রেও ভুল ভ্রান্তি বিষয়ে লিপিকর বা অনুলেকখগণ নিজেরাই পাঠককে শুদ্ধ করে নেবার অনুনয় বা স্বীকারোক্তি করেছেন। কোথাও কোথাও উচ্চারণগত প্রভাবে বানানের ভুলভ্রান্তি এবং রেফ (র্) যুক্ত শব্দের প্রাধান্য দেখা যায়। পুষ্পিকায় লিপিকরের নামধাম ঠিকানার মাধ্যমে বর্তমান ভৌগোলিক বিবর্তনের পরিচয় যেমন তাৎপর্যপূর্ণ তেমনি ক্ষেত্রবিশেষে ইতিহাসের সূত্র উল্লেখও গুরুত্বপুর্ণ। সর্বোপরি 'অনুলেখক' বা 'লিপিকর' নামে পরিচিত ব্যক্তি মানুষটি কেন বিচিত্র সব কথার সংযোজনে 'পুষ্পিকার' সৃষ্টি বা অবতারণা করেছেন তা মনস্তাত্ত্বিক সমীক্ষার অভিনব অধ্যায় হিসেবে আদৃত হতে পারে।